তবে নারী আন্দোলন নিশ্চিতভাবে অনেকাংশে নরমপন্থী হয়ে পড়েছে। নারী আন্দোলনের জঙ্গী ও বৈপ্লবিক ধারা ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। নারীবাদী পত্রপত্রিকাসমূহে সুস্পষ্ট সংশোধনবাদী প্রকৃতি প্রকাশ পাচ্ছে। আধুনিককালের নারীবাদী চিন্তাবিদ্‌রা অধিকতর খোলামনের মানুষ। রাজনীতিকভাবে তাঁরা তেমন র‍্যাডিক্যাল নন। ক্যামিল্লে পাগলিয়া (Camille Paglia)-র মত সাম্প্রতিককালের নারীবাদীরা 'মহিলারা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার' এই সাবেকি ধারণাকে বাতিল করার পক্ষপাতী। বরং তাঁরা নিজেদের যৌন ও ব্যক্তিগত আচরণের ব্যাপারে মহিলাদের অধিকতর সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অ্যান্ড্রু হেউড-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই সমাজবিজ্ঞানী তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন : "Quite simply, feminism will survive as long as patriarchy persists. However, feminism's chief challenge in the twenty-first century is to establish a viable and coherent 'third wave' that is capable of making sense of the changing nature of gender relations and of exploding the myth of post-feminism."

## ৮.১২ সামাজিক লিঙ্গ/জেন্ডার ও রাজনীতি (Gender and Politics)

**জেন্ডার শব্দের ব্যঞ্জনা** ∫∫ প্রত্যেক সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শের ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি মানুষ নারী বা পুরুষ হিসাবে সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি বা মর্যাদা লাভ করে। আবার যে কোন সমাজের সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়ে উঠে কতকগুলি বিষয়ের সম্মিলনে। এই বিষয়গুলি হল অধিকার, কর্তব্য, লোকাচার, লোকনীতি, পরিচিতি প্রভৃতি। সমাজতত্ত্বে বা রাজনীতিক সমাজতত্ত্বে 'জেন্ডার' শব্দটির ব্যঞ্জনা নিছক একটি লিঙ্গগত জৈবিক শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। 'জেন্ডার' হল পৌরুষ বা নারীত্বের এক বিশেষ ধারণা। এই ধারণা জৈবিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জৈবিকতার অতিরিক্ত। সমাজ নির্বিশেষে এর কোন সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করা যায় না।

**যৌন পার্থক্য ও লিঙ্গ পার্থক্য** ∫∫ নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র জৈবিক পার্থক্য নয়। নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন পার্থক্য ও লিঙ্গ পার্থক্যকে পৃথকভাবে প্রতিপন্ন করা হয়। যৌন পার্থক্য বলতে নারী-পুরুষের দৈহিক পার্থক্যের কথা বলা হয়। অপরদিকে লিঙ্গ পার্থক্য নিহিত থাকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক পার্থক্যের মধ্যে। পুরুষসত্তা ও নারী সত্তার মধ্যে পার্থক্য মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়।

**লিঙ্গভিত্তিক** সামাজিকীকরণ ∫∫ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। শিশুদের বড় হয়ে উঠার সমগ্র ধারাটি জুড়ে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াটি প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় নারী-পুরুষ কেউই এই লিঙ্গ-পার্থক্যের এই জটিল চক্রকে অতিক্রম করতে পারে না।

**ক্ষমতার যৌন ব্যবস্থা** ∫∫ এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ভূমিকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সন্তানের জন্ম দেওয়া, লালন-পালন করা এবং ঘর-সংসারের কাজকর্ম সম্পাদন করার মধ্যে নারীর দায়িত্ব সীমবদ্ধ থাকে। পুরুষের ভূমিকা রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। ক্ষমতা ও প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহে পুরুষের কর্তৃত্ব সুবিদিত। পুরুষের এই প্রধান্য পিতৃশাসন (Patriarchy) হিসাবে পরিচিত। পিতৃশাসন হল আসলে ক্ষমতার একটি যৌন ব্যবস্থা। সামাজবিজ্ঞানীদের মতানুসারে নারীর সন্তান উৎপাদনকারী ভূমিকার ভিত্তিতেই ক্ষমতার এই যৌন ব্যবস্থা বিকশিত হয়।

**দেশ-কাল ভেদে নারী-পুরুষ** ∫∫ দেশ-কাল ভেদে পৌরুষ ও নারীত্বের ধারণা স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করতে দেখা যায়। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের পর্যায়গত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের মধ্যে গুণগতভাবে পৃথক প্রকৃতির সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ের উৎপাদন প্রক্রিয়ার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক উৎপাদনের মূল ধারণা হিসাবে নারীত্বের কথা বলা হয়। নারী প্রতিপন্ন হত মাতা হিসাবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। নারীর পরিচয় পরিবর্তিত হয়ে হল গৃহবধূ এবং পুরুষ হল অন্নদাতা। এ বিষয়ে অধ্যাপিকা সীমন্তী সেন তাঁর 'জেন্ডার ও রাজনীতি' শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের মানসিকতা অনুযায়ী 'পৌরুষ' হল বিজয়ের প্রতিশব্দ। বিপরীতক্রমে যাবতীয় অধীনতার পরিচায়ক হিসাবে 'নারীসুলভ' প্রকৃতির কথা বলা হয়। পরাধীন জাতি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির চেয়ে 'মেয়েলি'। ইংরেজরা ভারতীয়দের মেয়েলি বলেই বিবেচনা করত। এইভাবে একটি জাতি সামগ্রিক বিচারে মেয়েলি পরিচয় পায়। সুতরাং জাতি, শ্রেণী প্রভৃতির পর্যায়েও 'জেন্ডার'-এর ধারণার বিস্তার ঘটে থাকে।

**জেন্ডারের স্থানিক মাত্রা** ।। আবার জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। ব্যবহারিক জগতে নারী-পুরুষের মধ্যে এই ক্ষেত্রগত বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ জেন্ডারের স্থানিক মাত্রাও আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে রান্নাঘর হল মহিলাদের সার্বিক স্বাধীনতার সুবিদিত ক্ষেত্র। বিপরীতক্রমে সুঁড়িখানা, 'পাবলিক হল' প্রভৃতি হল পুরুষদের একচেটিয়া এলাকা। এই সমস্ত এলাকায় পুরুষসঙ্গী ব্যতিরেকে মাহিলাদের প্রবেশ সামাজিকভাবে অস্বীকৃত।

**আত্মিক ও ভাষাগত মাত্রা** ।। অধ্যাপিকা সীমন্তী সেনের অভিমত অনুযায়ী জেন্ডার-এর আত্মিক ও ভাষাগত মাত্রাও বর্তমান। এর মধ্যে মহিলাসুলভ মনোবৃত্তি, পুরুষসুলভ মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আসে আচার-ব্যবহারের চালচলন, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম, সামাজিক গতিবিধির এলাকা প্রভৃতি। জীবনধারার পরিসর-পরিমন্ডল, কথাবার্তার রকমসকম, সাজপোশাকের ধরনধারণ প্রভৃতির মধ্যেও পুরুষালি-মেয়েলি পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়। ভাষাও জেন্ডার-এর ধারণার দ্বারা ব্যাপৃত হয়।

**জেন্ডার শব্দের রাজনীতিক ব্যঞ্জনা** ।। আবার ইতিহাস ও সমাজভেদে জেন্ডার-এর মাত্রাগত বিভিন্ন ধারণার পরিবর্তন ঘটে। মানবসভ্যতা জুড়ে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠে বিভিন্ন সামাজিক ও আত্মিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এবং 'জেন্ডার' শব্দটির মাধ্যমে এর অভিব্যক্তি ঘটে। পৌরুষ ও নারীত্বের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে 'জেণ্ডার' শব্দটির মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক অধীনতা, নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসম সম্পর্ক প্রভৃতিও অভিব্যক্তি লাভ করে। স্বভাবতই 'জেণ্ডার' শব্দটির সঙ্গে রাজনীতিক ব্যঞ্জনা সংযুক্ত এবং এই শব্দটি কোন দিক থেকেই মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়।

সুতরাং জৈবিক বিভাজন এবং বৃহত্তর সামাজিক-সাস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৌরুষ ও নারীত্বের বিভাজন হল দু'ধরনের বিভাজন। এই দু'ধরনের বিভাজনের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদনের জন্য 'লিঙ্গ' শব্দটির পরিবর্তে 'জেন্ডার' শব্দটির ব্যবহার অধিকতর অর্থবহ বলে বিবেচিত হয়। নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক বিভাজনই সব নয়। প্রতিটি সমাজের সুদীর্ঘ ও জটিল প্রকৃতির চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরুষ ও নারীত্বের ধারণার মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

**জেন্ডার রাজনীতির উদ্ভব** ।। রাজনীতির উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসাবে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্য প্রভৃতির কথা বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে জেন্ডার-রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের পর। নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আধিপত্যাধীন হওয়াটিকেই নারীসুলভ বলে বলা হয়। কৃত্রিমভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয়। পুরুষের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শের মাধ্যমে। এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শ পুরুষেরই সৃষ্টি। এ ধরনের বহু ও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও মতাদর্শ বর্তমান। শুধু তাই নয়, বিভিন্নভাবে জেন্ডার-রাজনীতির অভিব্যক্তি ঘটে থাকে।

**পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জেন্ডার-রাজনীতি** ।। পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জেন্ডার-রাজনীতির কর্তৃত্বমূলক এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। পিতৃতন্ত্র হল একটি প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রাযুক্ত ব্যবস্থা। এ হল নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কায়েম রাখার এক ব্যবস্থা। নারীবাদী সমাজবিজ্ঞানী কমলা ভাসীন পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। (ক) পুরুষ নারীর উৎপাদন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। নারীর উদয়াস্ত অক্লান্ত গৃহকর্ম অবৈতনিক এবং স্বীকৃতিহীন। নারীর গার্হস্থ্য শ্রম সামাজিক উৎপাদনের অংশ হিসাবে গ্রাহ্য হয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক-সাস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যে কোন নারী কাজকর্মের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পায় না। (খ) নারীর প্রজনন ক্ষমতাও পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। পরিবার পরিকল্পনা ও আনুষাঙ্গিক বিধিব্যবস্থা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। (গ) নারীর যৌনতার অধিকারও নারীর নয়, পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাষ্ট্র এবং ধর্ম এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সক্রিয় হয়। পুরুষের যৌনাকাঙ্খার পরিতৃপ্তির উপায় হিসাবে এবং এমনকি বাণিজ্যিক মাধ্যম হিসাবে নারীকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়।

**ধর্ম ও জেন্ডার-রাজনীতি** ।। জেন্ডার-রাজনীতির প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও বঞ্চনামূলক ব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকার কথা বলা হয়। বিভিন্ন দেশে ও জনসম্প্রদায়ের মধ্যে নারী সমাজের উপর পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব কায়েম করার ভিত্তি তৈরী করেছে বিভিন্ন ধর্মমত। বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে পক্ষপাতদুষ্ট নারী বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়েছে।

**অর্থনীতি ও জেন্ডার-রাজনীতি** ।। জেন্ডার-রাজনীতির বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও ঘটে। নারী সমাজ অধিকমাত্রায় পুঁজিবাদী শোষণের শিকার হয়। সম্পত্তির ভাগ ও ভোগের ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য সুবিদিত। সম্পত্তির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়। নারীর পক্ষে সম্পত্তির অধিকারের সীমিত আইনি ব্যবস্থাও সামাজিক আবেগ ও চাপের কাছে সরাসরি নতি স্বীকার করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এক পরিসংখ্যান অনুসারে পৃথিবীর সকল কাজের ষাট শতাংশের

অধিক সম্পাদিত হয় মহিলাদের দ্বারা। অথচ পৃথিবীর সর্বমোট আয়ের মাত্র দশ শতাংশ পায় মহিলারা। আবার পৃথিবীর মোট সম্পত্তির মাত্র এক শতাংশের মালিকানা মহিলাদের হাতে।

**জেন্ডার-রাজনীতি ও রাজনীতিক অংশগ্রহণ** ∫∫ বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের মান ও মাত্রার ক্ষেত্রেও জেন্ডার-রাজনীতির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে প্রচলিত বক্তব্য অনুযায়ী রাজনীতির জগৎ হল পুরুষের জগৎ। অধিকাংশ দেশ ও সমাজব্যবস্থায় সাধারণভাবে এই ধারণার প্রচলন ও প্রাধান্য দেখা যায়। রাজনীতিক ব্যবস্থা পুরুষপ্রাধান্যযুক্ত হওয়ায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মহিলাদের মধ্যে অনীহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহে পুরুষের প্রাধান্য প্রশ্নাতীত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। সেই মার্কিন মুলুকে অদ্যাবধি কোন মহিলা রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হতে পারেননি। ভারতেও আজ পর্যন্ত সংসদে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বিল পাস করান গেল না। রাজনীতিক দলগুলির গঠনব্যবস্থার মধ্যেও পুরুষ-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতিক দলসমূহের আভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রেও পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অথচ রাজনীতিক দলগুলি নিজেদের গণভিত্তির প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন। এতদ্‌সত্ত্বেও রাজনীতিক দলগুলি পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের অচলায়তনকে আঘাত করতে সাহস করে না। গ্রামীণ পর্যায় থেকে সংসদ পর্যন্ত সকল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পুরুষেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

**জেন্ডার-রাজনীতি ও আইনি ব্যবস্থা** ∫∫ জেন্ডার-রাজনীতির অভিব্যক্তি আইনি ব্যবস্থার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থার সমর্থনে গৃহের কর্তা হল পুরুষ; শিশুর স্বাভাবিক অভিভাবক হল পুরুষ; সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণে প্রাধান্য পায় পুরুষ প্রভৃতি। বহু দেশেই আইনানুসারে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। তা সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দাবি করা যায় না। কারণ আইনের জগতে পুরুষেরই প্রাধান্য। সাধারণত পুরুষেরাই আইনকে কার্যকর করে। স্বভাবতই আইনের জগৎটিও পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত নয়। এই কারণে নারীসমাজ সমানাধিকারের আইনের সম্যক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।

**জেন্ডার-রাজনীতি ও গণ-মাধ্যমসমূহ** ∫∫ জেন্ডার-রাজনীতির বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমসমূহের ইতিবাচক ভূমিকা অনস্বীকার্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যমসমূহের মাধ্যমে জেন্ডার-রাজনীতির অভিব্যক্তি ঘটে। বেতার, সংবাদপত্র, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে নারীদের এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যে, লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্য প্রকট হয়ে পড়ে। বিভিন্নভাবে নারীদেহকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করে বিপণন ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। মহিলাদের গৃহকেন্দ্রিকতা ও অধীনতামূলক অবস্থানকে বড় করে দেখান হয়। পাশাপাশি পুরুষদের প্রাধান্যমূলক অবস্থানকে তুলে ধরা হয়। গণমাধ্যমসমূহের সুবাদে জেন্ডার-রাজনীতি ও পিতৃতান্ত্রিকতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে লিঙ্গ-বৈষম্যভিত্তিক ব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংহত ও সমৃদ্ধ করে। সামাজিক জীবনধারার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও জেন্ডার-রাজনীতি বা মহিলাদের অধীনতামূলক অবস্থানও ভূমিকা এবং পুরুষের আধিপত্যসূচক অবস্থান ও ভূমিকা প্রতিপাদন করা হয়।

নারীবাদ হল একটি একমুখী মতাদর্শ। নারীবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শগত ধারা বা ঐতিহ্যও আছে। এ সবের সৃষ্টি হয়েছে প্রতিষ্ঠিত কিছু মতাদর্শ বা মতবাদ থেকে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল উদারনীতিবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের উত্তর আধুনিকতাবাদ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কথা বলা যায়। এই সমস্ত মতবাদ সাধারণভাবে সাম্যের ব্যাপারে সহানুভূতিযুক্ত। স্বভাবতই এই সমস্ত মতবাদ মহিলাদের সামাজিক ভূমিকার পরিধিকে প্রসারিত করার পক্ষপাতী।

বিপরীতক্রমে ক্রমস্তরবিন্যস্ত বা এলিট মতাদর্শসমূহ সাধারণভাবে নারীবাদের বিরোধিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ঐতিহ্যবাদী রক্ষণশীল মতবাদের কথা বলা যায়। এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এবং সার্বজনিক (Public) পুরুষ ও ব্যক্তিজনিক (Private) মহিলার মধ্যে শ্রমের লিঙ্গগত বিভাজন স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। গৃহবধূ এবং মাতৃত্বের জন্যই মহিলাদের জন্ম। এই নিয়তি বা ভবিতব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অর্থহীন ও যুক্তিহীন। এ প্রসঙ্গে অ্যান্ড্রু হেউড (Andrew Heywood) তাঁর *Political Ideologies* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "At best, conservatives can argue that they support sexual equality on the ground that women's family responsibilities are every bit as important as men's public duties. Men and women are therefore equal but different."

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কারণে মহিলাদের সাবেকি অবস্থান ও মর্যাদা বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তখনই

প্রতিক্রিয়াশীল নারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল নারীবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় তথাকথিত ইসলামিক নারীবাদের মধ্যে। তবে নারীবাদের প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াশীল নারীবাদ হল নিছকই একটি স্ববিরোধী ধারণা। এই ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটি হল যে, ঐতিহ্যগত সার্বজনিক ও ব্যক্তিজনিক (Public/Private) বিভাজন মহিলাদের মর্যাদা ও সুরক্ষার সম্যক সহায়ক ছিল। হেউড এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: ''Indeed, it provides evidence of the cultural strength of patriarchy and its capacity to recruit women into their own oppression''.

## ৬.১৩ লিঙ্গবৈষম্য ও ভারতীয় সংবিধান (Gender Inequality and Indian Constitution)

রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে। ভারতে উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সদর্থক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির সমাহার পরিলক্ষিত হয়। ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার, চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতি এবং সংবিধানের অন্যান্য অংশে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ ধারায় অধীকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ ধারায় সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে বৈষম্যের মত লিঙ্গবৈষম্যকেও অস্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান ১৬ ধারায় সরকারি চাকরি বা পদ প্রদানের ক্ষেত্রেও লিঙ্গগত বৈষম্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানের ১৫ ধারায় সমানাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর বিশেষ মর্যাদার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত সংবিধানের চতুর্থ অংশে নারীজাতির সমস্যাদিকে বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদা এবং পুরুষের মতই পরিপূর্ণ নাগরিক-মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়ে নীতিবিগর্হিত কাজ করানো, বিনা বেতনে কাজ করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। আর্থনীতিক কাজকর্মের জন্য বা অন্যকোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারী, শিশু প্রভৃতি কেনাবেচা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক ও আইনি রক্ষাকবচ বর্তমান। এতদ্‌সত্ত্বেও এ দেশে নারী পুরুষের সমান সামাজিক ও আর্থনীতিক মর্যাদা অদ্যাবধি পায়নি। এই অধিকার আদায়ের জন্য নারীজাতি সংগ্রামের সামিল হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার হিসাবে গণ্য করা হয় না। গ্রামাঞ্চলে নারীজাতির এই হীনতা আরও প্রকট। গ্রামাঞ্চলে নারীর অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা অনেকাংশে পুরুষের দয়ার উপর নির্ভরশীল।

ভারতের সংবিধানে নারীজাতির মৌলিক স্বীকার করা হয়েছে। এ কথা ঠিক। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন দাবি করা যায় না যে, ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা লিঙ্গবৈষম্যের সব রকম সীমাবদ্ধতা থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত। ভারতের সাবেকি সমাজব্যবস্থায় ত বটেই, বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায়ও স্বামী-সন্তান ও পরিবারের সকল পরিজনের জন্য নারীকে উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। নারীর এই পরিশ্রমের পারিশ্রমিক তার জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন-ব্যয়ের থেকে বহুগুণ বেশি। নারীর এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান অন্যায়-অবিচারেরই অভিব্যক্তি।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীকে পরিবারের উপার্জনহীন সদস্য এবং এই কারণে পরজীবী সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরিবার পরিজনের জন্য নারীর অক্লান্ত পরিষেবাকে অনুৎপাদক শ্রম এবং আয়বিযুক্ত শ্রম হিসাবে গণ্য করা হয়। এ ধরনের আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীজাতির প্রতি আর এক রকম অন্যায়-অবিচার।

ভারতের সংবিধানে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত আইনে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি অবিদিত নয়।

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সমাজব্যবস্থায় নারীর স্বতন্ত্র পরিচয় ও মর্যাদা অস্বীকৃত। পতি ও পরিবারের পরিচয় ও মর্যাদাই হল পত্নীর পরিচয় ও মর্যাদা। স্ত্রীর পৃথক পরিচয় ও মর্যাদা নেই। গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারের নারী সদস্যদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে এ বিষয়ে শহরাঞ্চলের পরিস্থিতি অনেকাংশ পৃথক প্রকৃতির।